এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎ কাজে যায়।

— শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভ্রান্ত

বিপজ্জনক একটি ভ্রান্তি। পশুদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ রোধ আইন প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয় কঠোর ভাবে সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিল, তার ফলে গভীর সঙ্কটের মুখে পড়বে চর্মজাত দ্রব্য শিল্প, সমস্যায় পড়বেন বিপুল সংখ্যক কৃষক ও মাংস বিক্রেতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, এই সব শিল্প ও বাণিজ্যের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সব জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসে গোমাংস স্বাভাবিক উপাদান তাঁরাও। এর পাশাপাশি এই সিদ্ধান্ত আইনি দিক থেকে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনরীতির উপরেও হস্তক্ষেপ, যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি সামাল দিতে হবে রাজ্যগুলিকেই। ঠিক যে মুহূর্তে দেশের সামনে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ চাকরির বাজারে ক্রমাগত প্রবেশ করতে থাকা যুবাদের কর্মসংস্থানের নব নব পন্থার অনুসন্ধান, সেই সময়ে সহসা এই সিদ্ধান্তের ফল হতে পারে ঠিক তার বিপরীত — জীবিকা হারাতে পারে অজস্র মানুষ। উদাহণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ২৬৬৮৪ কোটি টাকার মহিষ-মাংস বিদেশে রপ্তানি করেছিল ভারত। কেন্দ্রীয় সরকারের এই একটি সিদ্ধান্তের ফলে এই বিপুল বাণিজ্যের উপর প্রশ্নচিহ্ন অঙ্কিত হল। এই বাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল মানুষের বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা কী হতে পারে, এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে এহেন সিদ্ধান্তের ফলে সমস্যায় পড়বে চর্মজাত দ্রব্য, সাবান এবং মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত গ্রিজ উৎপাদন সহ নানাবিধ শিল্পক্ষেত্র।

অন্য দিকে, যে বিপুল সংখ্যক কৃষক এখনও কৃষিকাজে গবাদি পশু ব্যবহার করে থাকেন এবং অসংগঠিত বাণিজ্যের অঙ্গ হিসেবে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ গরু ও মহিষের দুধের ব্যবসা করেন তাঁদের পশুগুলিও একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত ব্যবহার্য থাকে, যার পরে সেগুলি তাঁরা বিক্রি করে দেন। অতঃপর সেগুলির ক্রয়-বিক্রয় কঠিন হয়ে পড়লে সেগুলির ভরণ-পোষণের যে দায়ভার প্রধানত দরিদ্র কৃষক ও দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের উপর পড়বে, সেটিও বা তাঁরা বহন করবেন কী ভাবে, সেই প্রশ্নেরও কোনও সদুত্তর মেলেনি। আরও উদ্বেগের বিষয় হল সরকারের এই অবস্থানে উৎসাহিত হবেন বিভিন্ন স্বনিয়োজিত গোরক্ষক গোষ্ঠী যার ফলে সামাজিক সংঘাত বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রবল। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে সমগ্র দেশকে এক উদ্বেগজনক সঙ্কটের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করা।

দৃষ্টান্তমূলক

কোনও মর্মান্তিক ঘটনা আবেগমথিত করে যেমন, অনেক ক্ষেত্রেই সেই আবেগ ক্রোধেরও জন্ম দেয়। বিশেষত যদি মনে হয়, সেই অঘটনের জন্য দায়ী কোনও অন্য পক্ষ। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু তখন আসল লড়াই নিজের সঙ্গেই। কী ভাবে সেই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নচেৎ, অবাঞ্ছিত ক্রোধপ্রদর্শন। ভাঙচুর, তাণ্ডব, আইনশৃঙ্খলার প্রতি অনায়াস অবহেলা। অতি-ব্যক্তিগত কোনও দুঃখের অভিব্যক্তি, তখন জনরোষ-এর প্রকোপে, বঞ্চনার জবাব দেওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠে। হয়তো কারণটি ন্যায্য, কিন্তু গলদ প্রতিক্রিয়ায়। হাসপাতালে কোনও রোগীর মৃত্যুর ফলে নির্বিচারে ধ্বংসলীলায় সেই অযৌক্তিকতারই প্রতিফলন। ব্যক্তিগত দুঃখ ছাপিয়েও সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোনও বঞ্চনার ছায়া পড়ে এমন ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে। সম্প্রতি

পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতকেন্দ্রিক বা সাম্প্রদায়িক হিংসা তুলনায় অনেক কম, অথচ দলীয় মারামারি অবিরল

দুর্বল নাগরিক সমাজ, ফলে পার্টিই একমাত্র ভরসা

রাজ্যে এখন প্রায়শই দলবদল। এটিই স্বাভাবিক কারণ, দলীয় রাজনীতির উপরই বহু মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। তার থেকে মুক্তির জন্য দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জরুরি। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

উদয় দেব

গত চার দশকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট হল 'বড়ো' জাতীয় দল (কংগ্রেস ও বিজেপি) এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে বহু দূরে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অনেকটা তামিলনাড়ুর মতো। কিন্তু তামিলনাড়ুর সঙ্গে এই রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতির একটা বড়ো পার্থক্য হল দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও একদলীয় শাসনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব। গত চার দশকে সেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু কংগ্রেস বা বিজেপির মতো কোনও বড়ো জাতীয় দল দেয়নি। বরং সিপিআই(এম) ও তৃণমূলের মতো ছোটো জাতীয় দল দিয়েছে। অন্য দিকে, এই রাজ্যে কোনও একটি দল যদি বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তা হলে দেখা যাচ্ছে যে সেই দল রাজ্যের শাসনক্ষমতায় দীর্ঘমেয়াদে থাকে। যেমন সারা দেশের মতো এই রাজ্যেও ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত প্রথম পনেরো বছর কংগ্রেস শাসন। আবার ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনগুলোতে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আবহে ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তেমন গুরুত্ব ও মান্যতা দেন না। সেই দিক থেকে দেখলে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাস ও সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ২০১১ সাল থেকে তৃণমূলের মেয়াদ এই রাজ্যে দীর্ঘ হবার দিকেই ইঙ্গিত করে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা আসন ও ভোট দুটোই অনেকটা বাড়াল। গত কয়েক মাসের উপনির্বাচনে দেখা যাচ্ছে তাদের ভোট আরও ক্রমশ বাড়ছে। পাহাড় ও সমতলে আগে যে জায়গাগুলোতে বিরোধীরা ছিল সেই জায়গাগুলোতেও তৃণমূল তার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াচ্ছে।

এই রাজ্যে ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে কংগ্রেস দলটি ভাঙার পর তাদের প্রধান শক্তি ছিল তিন জেলা— মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর। এখন ওই জেলাগুলোতেও তৃণমূলের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। এই রাজ্যে কংগ্রেসের সীমিত ক্ষমতা ও ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার কারণেই তাকে তৃণমূলের হাত ধরতে হয় অথবা বামেদের। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে তাই এই রাজ্যে তৃণমূল ও বামফ্রন্ট, এই দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কংগ্রেসকে বার বার নির্বাচনী বোঝাপড়া করতে রাজ্যবাসী দেখেছে। যেমন ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট, আবার ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা। এই রাজ্যে কংগ্রেস, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাত ধরে আসন সংখ্যার নিরিখে বিধানসভার দ্বিতীয় বৃহত্তম দল আর ২০১৬ সালে বামফ্রন্টের সমর্থন নিয়ে আসন সংখ্যার নিরিখে প্রধান বিরোধী দল হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে রাজ্যে ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত ভোটের শতাংশের বিচারে কংগ্রেস কিন্তু ৯ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। অর্থাৎ ১৯৯৮ সাল থেকে সমস্ত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে ভোটের শতাংশের নিরিখে কংগ্রেসের মতো বড়ো জাতীয় দল এই রাজ্যে হয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্থান পাচ্ছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেখানে কংগ্রেস সর্বশেষ সব আসনে লড়েছিল সেই নির্বাচনে তারা মাত্র ৯.০৯ শতাংশ ভোট পায় যা নির্বাচকদের সমর্থনের বিচারে রাজ্যে চতুর্থ। তাই গত দেড় দশকের মতো আগামী দিনে তৃণমূল অথবা বাম-নির্ভরতা ছাড়া এই রাজ্যে কংগ্রেসের আর কোনও উপায় নেই।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের দলীয় রাজনীতির লড়াই এখন রাজ্যের বিরোধী পরিসর নিয়ে। সে দিকে লক্ষ করলে এই বিরোধী পরিসরের লড়াই মূলত বামেদের সঙ্গে বিজেপির। রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি বামফ্রন্ট না বিজেপি, এই লড়াই কিন্তু ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের পর থেকে হয়েই চলেছে। এ ক্ষেত্রে আসন সংখ্যার বিচার না করে মূলত নির্বাচনগুলিতে কে দ্বিতীয় হচ্ছে ও কে ভোটের বিচারে দ্বিতীয়, সেই হিসেব গুরুত্বপূর্ণ। বাম ও বিজেপির মধ্যে এই রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি কে, সেই লড়াই আগামী পঞ্চায়েত, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনেও লক্ষ করা যাবে।

> পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ দশক বিভিন্ন ছোট বড়ো বিরোধী আন্দোলন করেই বামেরা সাতের দশক থেকে একটা শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিল। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ইস্যুতে ক্রমাগত আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারলে বিরোধী পরিসর অচিরেই বিজেপির মতো অন্য কোনও শক্তি নিয়ে নেবে।

গত কয়েক বছর ধরে বামেরা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই কম করে মূলত সাংগঠনিক শক্তি ধরে রাখার উপর নজর দিয়েছে। কিন্তু সংগঠন আকাশ থেকে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে ১৯২০-র দশক থেকে দীর্ঘ পাঁচ দশক বিভিন্ন ছোট বড়ো বিরোধী আন্দোলন করেই বামেরা সাতের দশক থেকে একটা শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিল। রাজনৈতিক পরিসরে একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ইস্যুতে ক্রমাগত শক্তিশালী বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারলে বিরোধী পরিসর অচিরেই বিজেপির মতো অন্য কোনও শক্তি নিয়ে নেবে। তার কারণ হল সময়ের মতোই রাজনীতি কোনও স্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। তা সদা চলমান ও পরিবর্তনশীল।

বাম দলগুলোকে তাদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেমন রাজনীতি করতে হয় তেমন কিছু জনমোহিনী নীতিও গ্রহণ করতে হয়। কারণ তাকে ভোটে লড়তে হয়। যে কমিউনিস্টরা ভোটে লড়ে না, তারা বিপুল অংশের মানুষের থেকে জনবিচ্ছিন্ন। তাদের ভোট বয়কটের ডাকে মানুষ তেমন সাড়া দেয় না। কারণ মানুষের বিভিন্ন দাবিকে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকটা জায়গা দিয়েছে। যারা কোনও দলকেই সমর্থন করেন না (অর্থাৎ নোটা) তাদেরও জায়গা দিয়েছে। যারা ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের অনেক বৈধ এবং ন্যায্য সমালোচনা করেন তাঁরা কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের অনেক নমনীয় উপযোজন কিন্তু ভেবে দেখতে পারেন।

আমাদের দেশে একটা সাংবিধানিক গণতন্ত্র আছে। সেই গণতন্ত্রের মূলে আছে বিরোধীপক্ষকে শত্রু না ভেবে প্রতিপক্ষ ভাবা। ঘৃণা না করে রাজনীতি করা। ঘৃণার কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য হয় না। সেটা শুধু ঘৃণা ও হিংসা ছড়িয়ে বেড়ায় যার কোনও ইতি হয় না। ঘৃণা আর সংসদের ভিতর ও বাইরে থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। রাগ আর রাজনীতির মধ্যেও তো ফারাক করতে হয়। চিন্তার বিষয় যে উত্তরপ্রদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংঘ পরিবারের শাখা প্রশাখা এই ঘৃণাসর্বস্ব কীর্তিকলাপ করেই চলেছে। কে কী খাবে, কে কোন পেশায় নিযুক্ত থাকবে, কে কোন ধর্ম মানবে, কে কার সঙ্গে পরিণয় করবে ইত্যাদি ভারতীয় নাগরিকদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি আমাদের দেশের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানুষ খুন করছে। তাই এই রাজ্যে বিজেপি একবার প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং নাগরিক পরিষেবার ইস্যু ছেড়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বেআইনি নীতিবাগীশতা ও সাম্প্রদায়িক গুন্ডামির দাপাদাপি নিয়ে রাজনীতির ময়দান মেতে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। সেটা মোটেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

এই রাজ্যে জাত-পাত কেন্দ্রিক হিংসা বা সাম্প্রদায়িক হিংসা (যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়), অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। কিন্তু দলীয় মারামারি অনেক গুণ বেশি হয়। কারণ এই রাজ্যে রাজনৈতিক পরিচয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বহু মানুষ শুধু এই নিয়েই মাথা ঘামায় যে আসলে অমুক লোক ঠিক 'কোন দলের দিকে'? ২০১৪ সালের রাজ্যসভা নির্বাচন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে একটা নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটা হল বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে বহু নির্বাচনী প্রতিনিধি তৃণমূলে নাম লেখাচ্ছে। বিরোধীরা এই প্রক্রিয়ার পিছনে শাসকের চোখরাঙানি ও প্রশাসনিক হুমকিকে দায়ী করছে। সেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকলেও এই পালা করে দলবদলের পিছনে পশ্চিমবঙ্গের দলসমাজ (পার্টি সোসাইটি) যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে দলতন্ত্র বা পার্টিতন্ত্র বলা যেতে পারে সেটার ভূমিকা কিছু কম নয়। রাজ্যে নব্বইয়ের দশক থেকেই যে কোনও শাসক দলের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। শ্রমনিবিড় শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে রাজনীতিকে এ ভাবে বহু মানুষ পেশা হিসেবে গ্রহণ করত না। যেহেতু এখানে নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলো বহুদিন ধরেই ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং দলীয় রাজনীতি সেইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তাই রাজনীতির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তাই এই রাজ্যে যতই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে ভোট হোক না কেন, নির্বাচনের দিন গণ্ডগোল মারামারি হতেই থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভূলুণ্ঠিত হবার জন্য আমরা নিন্দা করব কিন্তু এটাই রূঢ় সত্য। কারণ একটা পৌরসভার ওয়ার্ড বা পঞ্চায়েতের উপর কয়েকশো মানুষের জীবন জীবিকা জড়িয়ে থাকছে।

রাজ্যে একটা পার্টিতন্ত্র থেকে আরেকটা পার্টিতন্ত্রের রূপান্তর ঘটছে। নতুন নতুন মানুষ পুরানো পার্টিতন্ত্র ছেড়ে নতুন পার্টিতন্ত্রে যোগ দিচ্ছে। কারণ সেই পার্টিতন্ত্রের উপর বহু মানুষের নিত্যদিনের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে। আর সেই পার্টিতন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই এক দলীয় শাসনের প্রাধান্য। গত কয়েক দশকে রাজ্য রাজনীতির এই মৌলিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কিন্তু কোনও 'পরিবর্তন' হয়নি। রাজ্য কে এই জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে শ্রমনিবিড় শিল্প (কৃষি নির্ভর শিল্প, হার্ডওয়্যার, গার্মেন্টস, পর্যটন, ট্যানারি, ইত্যাদি) কী ভাবে হয় সেই দিকে মন দিতে হবে। বড়ো শিল্প এখন অটোমেশনের ফলে এমনিতেই বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় শাসক পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ মিলে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কী ভাবে করা যায় সে দিকে কি একটু বেশি মন দেবেন?

লেখক কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক